ভারত উপমহাদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে
জিহাদ করা মুসলমানদের উপর

কেন ওয়াজিব?

(তৃতীয় পর্ব)

শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ

ভারত উপমহাদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুসলমানদের উপর কেন ওয়াজিব?

[তৃতীয় পর্ব]

শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ

ভারত : দারুল হরব হওয়া থেকে নিকট অতীত পর্যন্ত

প্রকাশনা

ভারত উপমহাদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুসলমানদের উপর কেন ওয়াজিব?

[তৃতীয় পর্ব]

ভারত : দারুল হরব হওয়া থেকে নিকট অতীত পর্যন্ত

শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ

- **প্রথম প্রকাশ**
  শাবান ১৪৪৪ হিজরী
  মার্চ ২০২৩ ইংরেজি

- **প্রকাশক**
  উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ
  আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ
  ওয়েবসাইটঃ https://fatwaa.org
  ইমেইলঃ ask@fatwaa.org
  ফেসবুকঃ https://fb.me/fatwa.org
  টুইটারঃ https://twitter.com/fatwaa_org_1
  ইউটিউবঃ https://www.youtube.com/@fatwaa_org
  টেলিগ্রামঃ https://t.me/fatwaa_org

- **মূল্য**
  বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

উলামায়ে হিন্দের অবদান

এ দেশ, অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশ (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) দারুল হারব হওয়ার পর দারুল ইসলাম হওয়ার পর্ব কখনও আসেনি। কেননা একটি ভূখণ্ড দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো হওয়া জরুরি ছিল তা এ ভূখণ্ডের ভাগ্যে জোটেনি।

বিগত দুইশত বছরে ভারত উপমহাদেশের উপর দিয়ে বহু পর্ব অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং হাজার রকমের পট পরিবর্তন তাতে হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই এ ভূখণ্ডকে দারুল ইসলাম বানানোর মতো ছিলো না। দুইশত বছরের সে সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আল্লাহ সঠিক কিছু বলার তাওফীক দান করুন।

আমাদের উপর দিয়ে কী বয়ে গেছে?

হিন্দুস্তান (তথা ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান) বিগত দুইশত বছর যাবৎ এমন এমন পর্ব অতিক্রম করেছে যেগুলো ধারণা করাও আজকের মুসলমানদের জন্য কঠিন। আর যেকোনো অতীত এমনই হয় যে, বর্তমানের মানুষেরা অতীতকে যতই পড়ুক এবং নিজের ভাবনার ঘোড়াকে যতদূরই হাঁকিয়ে নিয়ে যাক, তারা কখনও সরাসরি দর্শক ও পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তিদের অনুভূতির নাগাল পায় না। পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতির অনুভূতি, অতীত ও বর্তমানের পার্থক্যগুলোকে সে সময়ের লোকেরা যেভাবে অনুধাবন করতে পারে, সে সময়ে যারা ছিলো না তারা সেভাবে অনুভব ও অনুধাবন করতে পারে না।

এমনিভাবে যারা তাদের নিহত মা-বাবা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের রক্তাক্ত চেহারা তাদের হত্যাকারীদের হাতে দেখেছে, তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা ও বদলা নেয়ার দৃঢ়তা তাদের বরাবর হওয়া সম্ভব নয়, যারা সেসব হতাহতের ঘটনাগুলো নিজের চোখে দেখেনি, শুধু তা শুনেছে।

অনুরূপভাবে বাপ-দাদা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সহায়-সম্পত্তি এবং নিজের পরিশ্রমে তৈরি ঘরের প্রতি ভালোবাসা এক রকম হতে পারে না। নিজের রক্ত ও ঘাম ঝরানো উপার্জন কখনও বিনামূল্যের দান বরাবর হতে পারে না।

নোংরা ও ময়লা আবর্জনায় বসবাসকারী নোংরা পরিবেশের দুর্গন্ধ থেকে সেভাবে কষ্ট অনুভব করে না যেভাবে কোনো পরিচ্ছন্ন পবিত্র পরিবেশ থেকে নোংরা ও দুর্গন্ধময় পরিবেশে আগত ব্যক্তি অনুভব করে থাকে। তবে পবিত্র পরিবেশ থেকে আগত ব্যক্তির এ কষ্টও ধীরে ধীরে দূর হয়ে যেতে থাকে। দুর্গন্ধের অনুভব কমে যায়। কেন? দুর্গন্ধ দূর হয়ে গেছে? নাকি সে ব্যক্তি দুর্গন্ধকে সয়ে নিয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে, দুর্গন্ধ তার আপন উৎকট গন্ধ নিয়ে বহাল অবস্থায় আছে। পরিবেশও দুর্গন্ধময় এবং নোংরা ময়লা আবর্জনাও সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আগন্তুকগণ সে পরিবেশকে সয়ে নিয়েছে। আপন বানিয়ে ফেলেছে।

ভূমিকাস্বরূপ সংক্ষিপ্ততাকারে কিছু কথা বলার পর আমরা হিন্দুস্তানের সংক্ষিপ্ত কাহিনীর দিকে যাবো। এটি নিয়মতান্ত্রিক কোনো ঐতিহাসিক আলোচনা নয়, যার মধ্যে অতীতের প্রতিটি বিন্দু বিন্দুকে তুলে আনা হবে। বরং আমরা এখানে ইতিহাসের শুধু সে অংশগুলোর প্রতি মনোযোগ দেবো যেগুলো থেকে সাহায্য নিয়ে শত শত বছরের অস্পষ্টতাগুলো দূর করার চেষ্টা করা হবে। জাতীয়তাবাদের মূর্খতা, সাম্প্রদায়িকতা নির্ভর ছড়িয়ে থাকা ঘৃণা এবং দলাদলিমূলক শত্রুতার বীজ থেকে পবিত্র হয়ে শুধু একজন মুসলমান হিসাবে, ইতিহাসের যে কথাগুলোকে সামনে নিয়ে আসা জরুরি এবং ইতিহাসের যে পরিস্থিতিগুলোর উপর চিন্তা-ফিকির করা চাই, সে কথাগুলোকেই আমরা বিস্তারিত উল্লেখ করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

দুই কিংবা সোয়া দুই শতাব্দীব্যাপী ব্যাপ্ত এ ইতিহাসকে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি-

প্রথম ভাগ: হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়া থেকে মোগল সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত। এটি প্রায় পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস।

দ্বিতীয় ভাগ: মোগল সাম্রাজ্যের পতন থেকে ভারত স্বাধীনতা ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। এটি প্রায় একশত বছরের ইতিহাস।

তৃতীয় ভাগ: ভারতের স্বাধীনতা ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা থেকে পাকিস্তান বিভক্তি ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। যা প্রায় তেইশ/চব্বিশ বছরের সংক্ষিপ্ত একটি মেয়াদ।

চতুর্থ ভাগ: পাকিস্তান বিভক্তি ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, যা প্রায় পঞ্চাশ বছরের সময়কাল।

প্রথম ভাগ: দারুল হারব ফাতওয়া থেকে মোগল সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত

(১৮০৮খ্রি. থেকে ১৮৫৭খ্রি.)

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু, যখন হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার ফাতওয়া দেয়া হয়েছিলো, তখন ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের অস্তিত্ব ছিলো, কিন্তু তাদের কোনো শক্তি সামর্থ্য ছিলো না, রাজত্বের সিংহাসন তাদের কাছে ছিলো, কিন্তু রাজত্ব তাদের হাতে ছিলো না। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ এর ফাতওয়ার সুনির্দিষ্ট তারিখ বলা একটু মুশকিল। তবে ইতিহাসবিদগণ ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে এর তারিখ হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন। মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী রহিমাহুল্লাহ লিখেন-

1803"ع میں جب کہ ایسٹ انڈیا کمپني کے نمائندے نے شاہ دهلي سے ملکي انتظام کا پروانہ جابرانہ طریقے سے لکھوا کر ملک میں اعلان کر دیا کہ خلق (مخلوق) خدا کي، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپني بھادر کا، تو شاہ عبد العزیز نے هندوستان کے دار الحرب هوجانے کا فتوی جاري فرمایا اور مسلمانوں کو آزادئ هند کے لئے آمادہ کرنا ضروري سمجھا (مذکورہ مفصل فتوی فتاوی عزیزیۃ صفحہ 17 پر موجود هے)۔ واقعات نے بتلادیا ھتا کہ هندوستان کے موجودہ حکام وامراء میں سے اب کسي میں طاقت اس بدیسي غیر مسلم قوم کے مقابلہ اور دفع کرنے کي ایسي نھیں رھي جس پر اطمینان کیا جائے۔

لهذا مسلمانوں کے لئے احوال پر غور کرنا اور آزادي کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا از بس ضروري ھے، جو کہ ھر دار الحرب کے باشندے پر لازم ھے۔ چنانچہ اس کے بعد سے جد جھد شروع ھوئي۔ (نقش حیات ص410,411)

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিরা দিল্লির শাহ থেকে জোরপূর্বক রাষ্ট্র পরিচালনার পরওয়ানা লিখিয়ে নিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছিলো যে, সৃষ্টি আল্লাহর, দেশ মহামান্য বাদশাহর এবং আদেশ-নিষেধ কোম্পানি বাহাদুরের- তখন শাহ আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ হিন্দুস্তান দারুল হারব হয়ে যাওয়ার ফাতওয়া প্রদান করেছেন এবং হিন্দুস্তানকে স্বাধীন করার জন্য মুসলমানদেরকে প্রস্তুত করা জরুরি মনে করেছেন। (উল্লিখিত বিস্তারিত ফাতওয়া 'ফাতাওয়া আযীযিয়া' পৃ: ১৭ এর মাঝে রয়েছে)। পরবর্তী ঘটনাবলী এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, হিন্দুস্তানে তখন শাসকবর্গের কারও মাঝে এ শক্তি ছিলো না যে, তারা এ ভিনদেশি অমুসলিম গোষ্ঠীর মোকাবেলা করবে এবং তাদের মাঝে এমন কেউ ছিলো না শত্রু প্রতিরোধের বিষয়ে যার উপর ভরসা করা যায়। আর তাই মুসলমানরা তাদের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করা এবং স্বাধীনতার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী জরুরি হয়ে পড়েছে, যা যেকোনো দারুল হারবের অধিবাসীদের উপর জরুরি। যার ফলে এরপর থেকে চেষ্টা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।" -নকশে হায়াত পৃ: ৪১০-৪১১

উল্লিখিত ফাতওয়া প্রদান করার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর হিন্দুস্তানে মোগল শাসনের অবসান ঘটেছে এবং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল শাসনের সর্বশেষ শাসক সুলতান বাহাদুর শাহ যফরকে দেশান্তর করার মধ্য দিয়ে হিন্দুস্তান থেকে মুসলিম রাজত্বের জানাযা বের করা হয়েছে। এ পঞ্চাশ বছর সময়কালে রাজত্বের সিংহাসন মুসলমানদের হাতে ছিলো, দিল্লির লাল কেল্লাও মুসলমানদের হাতে ছিলো, কিন্তু এরপরও হিন্দুস্তান দারুল হারব ছিলো। মোগল রাজত্ব বহাল থাকা অবস্থায়ও হিন্দুস্তান দারুল হারব ছিলো, শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল যাবৎ মুসলমানদের হাতে রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও তা দারুল হারব হয়ে গেছে!

অনুল্লেখযোগ্য ইখতিলাফ, কিছু ইলহাদ ও কিছু পদস্খলন

এ পর্যায়ে একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। বিষয়টি হচ্ছে, এ সময়ে হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার বিষয়ে কেউ কেউ দ্বিমতও করেছে। এমনিভাবে মোগল সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরের সময়গুলোতে যখন শাসনক্ষমতা শতভাগ কাফেরদের হাতে ছিলো, তখনও কিছু মানুষ, কাদিয়ানী সম্প্রদায় এবং তাদের মতো আরও কিছু ফিরকা এ বিষয়ে ইখতিলাফ করেছে এবং ইখতিলাফ করতে থেকেছে। আর পৃথিবীতে এমন কোন মাসআলা আছে যা নিয়ে কেউ না কেউ দ্বিমত করেনি? দেখার বিষয় হচ্ছে, দ্বিমত পোষণকারী কি দলীলের আলোকে দ্বিমত করেছে? নাকি গোষ্ঠীগত গোঁড়ামির ভিত্তিতে ইখতিলাফ করেছে? নাকি নেফাক ও ইলহাদের ভিত্তিতে দ্বিমত করেছে? নাকি কোনো ভুল বোঝাবুঝির কারণে দ্বিমত করেছে? যদি কোনো শুবাহ তথা ভুল বুঝের কারণে দ্বিমত করে থাকে তাহলে সে মাযূর, আর যদি নেফাক ও ইলহাদের ভিত্তিতে দ্বিমত করে থাকে তাহলে সে অভিশপ্ত এবং গালমন্দ পাওয়ার উপযুক্ত।

হিন্দুস্তানের হকপন্থী উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারত উপমহাদেশের পাক ও হিন্দ দারুল হারব হয়ে গিয়েছিলো। কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে এ সিদ্ধান্তই সঠিক ছিলো। এরপরও নেফাক, ইলহাদ ও যান্দাকায় পতিত লোকেরা ব্রিটিশ শাসিত এ ভারত উপমহাদেশকে দারুল ইসলাম দাবি করতে থেকেছে। তারা ব্রিটিশ হুকুমতের পক্ষ থেকে এমন নিরাপত্তা ও শান্তি পাচ্ছিলো যে নিরাপত্তা ও শান্তি ইসলামী শাসনের পক্ষ থেকেও তারা কখনও পায়নি। এ লোকদের দৃষ্টিতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফাসাদ ও ফিতনা ছিলো এবং কাফেরদের আনুগত্য তাদের দৃষ্টিতে ওয়াজিব ছিলো। সেসকল মুলহিদ ও যিন্দিকদের চিন্তা-ভাবনা এবং তাদের কথাবার্তা ও মতামতের দিকে দৃষ্টি দেয়ার না কোনও প্রয়োজন আছে, আর না এর কোনও সুযোগ আছে।

তবে আহলে হক উলামায়ে কেরাম থেকেও কারও কারও কলমের মাথায় এমন কিছু কথা এসে গেছে যা দলীলের আলোকে ভুল ছিলো এবং সমকালীন উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিপরীত ছিলো। আর এ কারণে অনুল্লেখযোগ্য কিছু দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার বিষয়ে যে ফাতওয়া দিয়েছিলেন সে ফাতওয়ার আলোকেই হিন্দুস্তানের

হকপন্থী উলামায়ে কেরাম আমল করেছেন এবং হিন্দুস্তানের উপর সাম্রাজ্য বিস্তারকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেছেন এবং নিজেদের সীমিত সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণ নিয়েই ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকেন। কুরবানী দিতে থাকেন, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে থাকেন। আল্লাহর দুশমনদেরকে মারতে থাকেন এবং নিজেদের ফরয দায়িত্ব আদায় করতে থাকেন।

ফরয আদায়ের একটি অনুসরণীয় আদর্শ

দারুল ইসলাম, যা অনৈসলামিক প্রভাব বিস্তারের কারণে দারুল হারব হয়ে যায়, তা পুনরুদ্ধারের জন্য এবং অনৈসলামিক শাসনকে বিতাড়িত করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের যে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিলো, বালাকোটের ময়দান তার একটি স্মরণীয় উজ্জ্বল পর্ব। রায়বেরেলীর সাইয়েদ বংশের অনবদ্য মুরশিদে কামেল, মুজাহিদে মিল্লাত, সাইয়েদ আহমাদ শহীদ বেরেলবী রহিমাহুল্লাহ এর নেতৃত্বে এবং তাঁর অসাধারণ সেনাপতি মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহিমাহুল্লাহ এর পরিচালনায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে।

সাইয়েদ আহমাদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ রহিমাহুল্লাহ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী রহিমাহুল্লাহ এর দরবারেরই লালিত সন্তান। আপনি যদি ইতিহাসের পাতাগুলোতে নযর বুলিয়ে দেখেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন, আমাদের সালাফের ইলমী কেন্দ্রগুলো থেকে যেমনিভাবে ইলম শিখা ও শিখানোর ধারাবাহিকতা চালু ছিল, তেমনিভাবে সময়ের সকল শরয়ী যিম্মাদারীও এ সকল ইলমী মারকায থেকেই আদায় হতে থেকেছে। যার ফলে এ মারকাযে ইলমী থেকেই হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার ফাতওয়া দেয়া হয়েছে এবং এ মারকাযে ইলমী থেকেই জিহাদের সূচনা হয়েছে এবং এ ইলমী মারকায থেকে শিক্ষা সমাপনকারী ইলম ও আমলের শাহসাওয়ারগণই ইসলামী হুকুমত পুনরুদ্ধারের জন্য এবং প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিগুলোকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত এ পথে নিজেদের গর্দানগুলো কুরবান করে দিয়েছেন।

সংক্ষিপ্তভাবে বললে বলা যায়, তখন পরিস্থিতি এমন ছিলো যে, হিন্দুস্তানকে দারুল হারব ঘোষণা দেয়া হয়ে গেছে। দেশের শাসকবর্গ মুসলমান ছিলো। আধিপত্য কাফেরদের ছিলো। আইনের প্রতিষ্ঠানগুলো কাফেরদের আইনের অধীনে পরিচালিত হত। আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সশস্ত্র বাহিনীর মালিক ছিলো। সাধারণ মুসলমানদের মাঝে মূর্খতা, ভ্রষ্টতা মহামারীর মতো ছড়িয়ে ছিলো। নেফাক ও ইলহাদের জাল বিছানো ছিলো। সব ধরনের ষড়যন্ত্রের ফাঁদ ঘিরে রেখেছিলো। দীনের প্রতিটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিষয়কে সন্দেহযুক্ত করা ও বিতর্কিত করে তোলার নকশা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিলো। ইসলামের দুশমন, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফেরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা এবং তাদের পদচুম্বন করার জন্য ঈমান বিক্রেতাদের একটি বড় জামাত নিজেদের ঈমান বিক্রয়ের লেনদেন সম্পন্ন করে ফেলেছিলো। উলামায়ে সূ ও অপব্যখ্যাকারীদের একটি বড় সংখ্যা তাহরীফ ও অপব্যাখ্যার বাজার গরম করে চলছিলো। জিহাদী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার চালু ছিলো। দেশি-বিদেশি দুশমনের সংখ্যা ও শক্তি অনুমান করাও মুশকিল ছিলো, যখন মুজাহিদগণের সংখ্যা ছিলো নিতান্তই নগণ্য। উভয়পক্ষের সংখ্যা ও শক্তির মাঝে কোনও প্রকার তুলনা করার মতো অবস্থাই ছিলো না। শুধু বালাকোটের একটি রণাঙ্গনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, আপনি দেখতে পাবেন মুসলিম মুজাহিদগণের সংখ্যা সাত শত, যখন শত্রুসৈন্যের সংখ্যা ছিলো দশ হাজার। আপনি ইতিহাসের দিকে চোখ মেলে দেখুন, ইসলাম ও কুফরের মাঝে সংঘটিত রণাঙ্গনগুলোতে দুইপক্ষের সংখ্যার মাঝে তুলনা করার মতো কোনো অবস্থা ছিলো না। কিন্তু মুসলমান যখনই নিজের রবের উপর ভরসা করে নিজেদের ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে লড়াই করেছে তখনই তারা বিজয় লাভ করেছে।

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠাতাগণের পদক্ষেপ

আধিপত্য বিস্তারকারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আমাদের আকাবির-আসলাফ যেসব রণাঙ্গনে লড়াইয়ের জন্য শত্রুর মুখোমুখি হয়েছেন, সেসকল ময়দানের এ একই চিত্র ছিলো। কিন্তু এরপরও তাঁরা নিজেদের শরয়ী যিম্মাদারী আদায় করা থেকে বিমুখ হননি। বালাকোট ময়দানের যে চিত্র আপনাদের সামনে

তুলে ধরা হয়েছে তার প্রায় পঁচিশ বছর পর শামেলীর ময়দানে সে একই দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে আসে।

আমাদের আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ যাঁদেরকে প্রথম সারির আকাবির হিসাবে ধরা হয়, তাঁরা জিহাদের সামান্য আয়োজন নিয়েই অগণিত সংখ্যক সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে নেমে পড়েছেন। কেননা মাসআলা ছিলো দিফা তথা প্রতিরোধের। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহিমাহুল্লাহ এর নেতৃত্বে, কাসেম নানুতবী রহিমাহুল্লাহ সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহিমাহুল্লাহ বিচারপতির দায়িত্ব নিয়ে এবং আরও কিছু উলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ রণাঙ্গনটি সংঘটিত হতে পেরেছিলো।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে অনুপ্রবেশকারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বিষয় যখন উলামায়ে হিন্দ দিল্লি জামে মসজিদে সর্বসম্মত ফাতওয়া প্রকাশ করেছিলেন, তখন সে ফাতওয়া নিয়ে মতবিনিময়ের জন্য থানাভবনে উলামায়ে কেরামের পরামর্শ ডাকা হয়েছে। আলোচ্য বিষয় এটাই ছিলো যে, চলমান অবস্থায় অত্যাচারী দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে পারি কিনা? আর চলমান অবস্থায় জিহাদের বিধান কী? পরামর্শ মজলিসে দিল্লির উলামায়ে কেরামের জিহাদের ফাতওয়াকে সর্বসম্মতভাবে সমর্থন ও সত্যায়ন করা হয়ছে। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, মাওলানা কাসেম নানুতবী ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহিমাহুল্লাহ সবাই উপস্থিত ছিলেন। শুধু মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ থানভী রহিমাহুল্লাহ নামের এক বুজুর্গের মত এর বিপরীতে ছিলো। সে পরামর্শ মজলিসের একটি সুন্দর কথোপকোথন দেখুন-

“হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব হযরত শায়খ মুহাম্মদ সাহেবেকে সম্বোধন করে অত্যন্ত আদবের সাথে নিবেদন করলেন, হযরত! কী কারণে আপনি ইসলাম ও দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরয বলেন না, এমন কি জায়েযও মনে করেন না?

হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ: এ কারণে যে, আমাদের কাছে জিহাদের অস্ত্র ও উপাদান নেই। আমরা একেবারেই সহায় সম্বলহীন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব: আমাদের কাছে কি এতটুকু সামানপত্রও নেই যতটুকু বদর যুদ্ধের সময় ছিলো?

হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ: যদি আপনার সকল দলীল ও সব কথা মেনেও নেই, এরপরও জিহাদের সবচেয়ে বড় শর্ত হচ্ছে ইমাম নির্ধারণ করা। সে ইমাম কোথায়? যার অধীনে জিহাদ করা হবে?

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম: ইমাম নির্ধারণ করতে কতক্ষণ আর সময় লাগে! মুরশিদে বরহক হযরত হাজী সাহেব রয়েছেন। তাঁর হাতেই জিহাদের বাইআত করে নেয়া হোক!

হাফেয যামেন সাহেব বললেন, ব্যস, বুঝে এসে গেছে। এরপর সবাই হযরত হাজী সাহেবের হাতে জিহাদের বাইআত করলেন।" -নকশে হায়াত, মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী রহিমাহুল্লাহ পৃ: ৫৫১-৫৫২

এ ঘটনাটি যেমনিভাবে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ, তেমনিভাবে আমাদের চলমান আলোচ্য বিষয়ে ঘটনাটি দলীল প্রমাণ নির্ভর একটি উপযুক্ত জবাবও বটে।

'নুযহাতুল খাওয়াতিরে' এক নযর

আল্লামা আব্দুল হাই রহিমাহুল্লাহ তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'নুযহাতুল খাওয়াতির' এ লিখেন-

وثار المسلمون وأهل البلاد على الحكومة الإنجليزية سنة أربع وسبعين ومائتين وألف، وقامت جماعة من العلماء والصلحاء وأهل الغيرة من المسلمين في سهارنبور ومظفرنكر فأعلنوا الحرب على الإنكليز واختاروا الشيخ إمداد الله أميراً لهم، واشتبك الفريقان في ميدان شاملي قرية من أعمال مظفرنكر فقتل حافظ محمد ضامن شهيداً، وانقلبت الدائرة على المسلمين ورسخت أقدام الإنكليز.

واشتد بطشهم بكل من اتهم بالمشاركة في هذه الثورة، وضاقت على العلماء العاملين الغيارى الأرض، وضاق مجال العمل في الهند، وقضى بعض الرفقة مدة في الاختفاء والانزواء، ولجأ بعضهم إلى الهجرة ومغادرة البلاد، وآثر الشيخ إمداد الله الهجرة إلى مكة المكرمة، ودخل مكة سنة ست وسبعين ومائتين وألف

وألقى رحله بالبلد الأمين، وكان أول إقامته على الصـــفا ثم انتقل إلى حارة الباب حيث قضى حياته ولقي ربه.

“হিন্দুস্তানের মুসলমানরা ১২৭৪ হিজরীতে ইংরেজ হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং উলামায়ে কেরাম, সালেহীনের জামাআত এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানদের একটি কাফেলা সাহারানপুর ও মুযাফফর নগরে জড়ো হয়েছেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.কে নিজেদের আমীর বানিয়েছেন। মুযাফফর নগর জেলার একটি জনবসতি শামেলীর ময়দানে উভয়পক্ষের মাঝে লড়াই হয়েছে। সে যুদ্ধে হাফেজ যামেন সাহেব শাহাদাত বরণ করেন। মুসলমানদের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং ইংরেজদের অবস্থান মজবুত হয়ে গেছে।

এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ইংরেজদের পাকড়াও কঠিন হতে থাকে। জিহাদের কার্যক্রমের সাথে জড়িত আত্মমর্যাদাশীল উলামায়ে কেরামের জন্য পৃথিবী তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং হিন্দুস্তানে কাজের ময়দান সঙ্কুচিত হয়ে যেতে লাগলো। তাঁদের কেউ কেউ কিছু দিনের জন্য আত্মগোপনে চলে গেলেন, আর কেউ কেউ হিজরতের পথ ধরেছেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ মক্কা মুকাররামার দিকে হিজরত করাকে প্রাধান্য দিলেন। তিনি ১২৭৬ হিজরীতে মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করেন এবং বালাদে আমীনে মুকীম হয়ে গেলেন। তিনি প্রথমে ‘সাফা’য় অবস্থান করেন, এরপর ‘হাররাতুল বাব’ এ স্থানান্তর হয়ে যান। সেখানে অবস্থানকালেই তিনি তাঁর রবের সাথে গিয়ে মিলিত হন।” -নুযহাতুল খাওয়াতির পৃ: ১১৯৪

সারকথা

হিন্দুস্তানের বিগত দুই কিংবা সোয়া দুই শতাব্দী ব্যাপ্ত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত যে পটভূমি আমরা তুলে ধরছি, তার প্রথম অংশ অধ্যয়নের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো সামনে আসে তা নিম্নরূপ:

এক. শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহিমাহুল্লাহ এর পক্ষ থেকে হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়া বিষয়ক ফাতওয়া প্রকাশের পর থেকে মোগল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি পর্যন্ত হিন্দুস্তান ধারাবাহিকভাবে দারুল হারব ছিলো। এ সময়কালের মধ্যে এ ভূখণ্ড কখনও দ্বিতীয়বার দারুল ইসলাম হতে পারেনি।

দুই. প্রায় পঞ্চাশ বছরের এ সময়কালে হিন্দুস্তানের শাহী মসনদে মুসলামনই আসীন ছিলো। এরপরও তা দারুল হারবই রয়ে গেছে। আকাবির উলামায়ে হিন্দ এ ভূখণ্ডকে দারুল হারবই মনে করতেন।

তিন. এ পঞ্চাশ বছর সময়কালে আগ্রাসী কাফেরদের বিরুদ্ধে উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে হিন্দুস্তানের মুসলমানরা লড়াই করতে থাকে এবং জিহাদ জারি রেখেছে।

চার. দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাগণ চলমান এ জিহাদের এই রণক্ষেত্রগুলোর একটি বড় অংশের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষার যাবতীয় যিম্মাদারী আদায় করার ক্ষেত্রেও তাঁদের মাঝে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের চিন্তা-ফিকির ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করা গেছে।

পাঁচ. নিজেদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি সংখ্যক নিয়মতান্ত্রিক সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে খুবই সামান্য শক্তি সামর্থ্য ও প্রস্তুতি নিয়েই তাঁরা জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হন। জিহাদের সামগ্রীর স্বল্পতা, জনশক্তির স্বল্পতা এবং কোনও কোনও আলেমের দ্বিমত ও বিরোধিতাও তাঁদেরকে তাঁদের ফরয দায়িত্ব আদায় থেকে বাধা দিয়ে রাখতে পারেনি। তাদের কাছে ফরয দায়িত্ব আদায় করাটাই সবচেয়ে বড় বিষয় ছিলো।

ছয়. বাহ্যিক পরাজয়ের পরও জিহাদের চিন্তা তাঁরা তাঁদের মাথা থেকে ফেলে দেননি। বরং সে উদ্দেশ্যেই তাঁরা আত্মগোপন করেন। সে জিহাদী কার্যক্রমকে জারি রাখার জন্য তাঁরা হিজরত করেন। দেশান্তর হন, শাস্তি ভোগ করেন, শাহাদাতকে গলায় জড়িয়ে নেন। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তাঁরা কাফেরদের সাথে সমোঝতা করেননি।

হিন্দুস্তান তখনও পর্যন্ত দারুল হারব হিসাবে যথারীতি বহাল থাকে। দারুল ইসলাম হওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি তখনও পর্যন্ত সামনে আসেনি।

দ্বিতীয় ভাগ: মোগল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি থেকে ভারত স্বাধীনতা ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত

(১৮৫৭ খ্রি. থেকে ১৯৪৭ খ্রি.)

এখন হিন্দুস্তান থেকে মোগল শাসন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু নামের রাজত্ব যতটুকু অবশিষ্ট ছিলো এখন তাও নেই। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে গণহারে হত্যা ও দেশান্তরের পর ইংরেজরা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে যে, তাদের বিরুদ্ধে এখন এমন আর কোনও শক্তি অবশিষ্ট নেই যা তাদের অগ্রযাত্রাকে বাধা দিতে পারে। মোগল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহ যফরকে গ্রেফতার করে দেশান্তর করে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মুসলিম মুজাহিদ ও সেনাপতিদের কাউকে ফাঁসি দেয়া হয়, কাউকে দেশান্তর করা হয়। আর এভাবে ইংরেজরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাব্য সকল জড় ও শিকড় উপড়ে ফেলে দেয়।

এতদিন পর্যন্ত তো ইংরেজরা একটি কোম্পানির শিরোনামের অধীনে নিজেদের সকল কার্যক্রম জারি রেখেছিলো। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের গণহত্যার পর তারা নিজেদেরকে সফল মনে করতে শুরু করেছে। আর তখন হিন্দুস্তানের শাসন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে সরাসরি ব্রিটিশ রাজত্বে পরিণত হয়ে যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়া যখন হিন্দুস্তানের শাসন নিজের হাতে নিয়েছে, আর তখনই হিন্দুস্তান সরকারিভাবে ব্রিটিশ রাজ্যের অধীনে চলে যায়। প্রায় একশত বছর ব্রিটিশ রাজত্ব হিন্দুস্তানের উপর চেপে বসে ছিলো। তাদের এ আগ্রাসন দারুল হারবের অবস্থানকে দারুল হারব হিসাবে মধ্যম স্তর থেকে সর্বশীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। একটি দারুল হারব ও দারুল কুফর হিসাবে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুস্তানে কুফরের বাজারকেই গরম করে এবং মুসলমানদের ঈমান, আকায়েদ, আমল, চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষা-দীক্ষার সকল শাখা প্রশাখাকে নির্মূল করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে। এমনিভাবে ইলমের যেসব কেন্দ্র থেকে ইসলাম ও ইসলামিয়াতের শিক্ষা ও প্রচার হত, সেসকল ইলমী মারকাযকে প্রভাবহীন ও ফায়দাহীন বানানোর সকল অপচেষ্টা চালু রাখে।

এখন আমরা দেখার চেষ্টা করবো, এ সময়কালে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও মুজাহিদগণ কী করছিলেন এবং এ শত বছর যাবৎ তাঁদের কর্মকাণ্ড কী ছিলো। আমরা ইতিহাসের শুধু সে অংশগুলোই তুলে আনার চেষ্টা করবো যা আমাদের বিষয়বস্তুর সাথে যুক্ত। আল্লাহ্ তাওফীকদাতা।

উম্মতের রাহবারগণের কর্মকাণ্ড

দিল্লির উলামা মাশায়েখ: দিল্লির ওয়ালীউল্লাহী খানদানের যে ঝাণ্ডা শাহ্ ইসহাক রহিমাহুল্লাহ এর হাতে ছিলো, তা তাঁর শাগরেদগণের মাধ্যমে সব সময় বুলন্দ ছিলো। তাঁদের মধ্যে শাহ আব্দুল গনী মুজাদ্দেদী, মাওলানা মামলুক আলী নানুতাবী, মিয়াঁ নযীর হোসাইন দেহলভী ও হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহিমাহুল্লাহ আজমাঈনের নাম শীর্ষে রয়েছে।

আকাবিরে দেওবন্দ: ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে আযাদী আন্দোলনে পরাজয়ের পর হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ মক্কা মুকাররামা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং অস্বাভাবিক কষ্ট ও পেরেশানি অতিক্রম করে মক্কা মুকাররামায় অবস্থান করেই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হিন্দুস্তানে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। -উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী খণ্ড: ৪, পৃ: ২৮৬।

এছাড়া মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, মাওলানা কাসেম নানুতবী, মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহিমাহুল্লাহ ও তাঁদের সমকালীন ও সমমনা উলামায়ে কেরাম নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও বহাল রাখার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে থাকেন।

তাঁরা হচ্ছেন সেসকল মহান ব্যক্তিবর্গ যাদের সাথে আমাদের ইলমী সূত্র যুক্ত এবং যাঁদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা ইলম, আমল ও জিহাদের ময়দানের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছি। এসকল উলামায়ে কেরাম ব্যতীত হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন চিন্তা-চেতনার মুসলিমগণ হিন্দুস্তানের আযাদী এবং হিন্দুস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা প্রচেষ্টা করতে থাকেন। যাঁদের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ এবং যাদের সবার উল্লেখ সম্ভব নয়।

মিল্লাতের অন্যান্য মুজাহিদগণ: সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী রহিমাহুল্লাহ এর জিহাদী কাফেলা বিভিন্ন শাখায় ভাগ হয়ে জিহাদের ময়দানে নিজেদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন। মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা ইনায়েত আলীর অনুসারীদের মধ্য হতে সাদেকপুরী উলামায়ে কেরাম নিজেদের এলাকায় এ চেষ্টা চালু রাখেন। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর অনুসারীগণ নিজেদের এলাকায় চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। মীর নেসারুদ্দীন তিতুমীরের অনুসারীরা নিজেদের হিম্মত ও দৃঢ়তা অনুযায়ী লড়াই করতে থাকেন। হাজী শরীয়াতুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁদের সাধ্যানুযায়ী ইসলামী শরীয়া প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অংশগ্রহণ করেন। মোটকথা যাঁর কাছে যতটুকু উপায়-উপকরণ ছিলো তিনি তাই কাজে লাগিয়ে দুশমনকে প্রতিহত করার জন্য কাজ করতে থাকেন।

একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা

এখানে একটি বাস্তবতা মেনে নিতেই হবে যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ঘটনাবলীর পরে সুদীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত পুরা হিন্দুস্তানে এক ধরনের নীরবতা বিরাজ করছিলো। যে কাফেলাগুলো তখনও পর্যন্ত উদ্দীপ্ত ছিলো পূর্ববর্তী সে উদ্দীপনার সাথে এখন আর তাদেরকে দেখা যাচ্ছিলো না। মুসলমানদের পক্ষ থেকে আক্রমণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ইসলামের দুশমন ইংরেজরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছিলো। তারা জীবন চলার পথে প্রতিদিন যেসকল আশঙ্কার মুখোমুখি হতে হত, সেসব আশঙ্কা এখন আর একেবারেই নেই।

কিন্তু এর অর্থ কখনও এটা নয় যে, মুসলিম মুজাহিদগণ তাঁদের যিম্মাদারীর কথা ভুলে বসে ছিলেন। কেননা পরবর্তী ইতিহাস এ কথা বলে যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে স্ফুলিঙ্গ তাঁদের বুকের ভেতর লুকিয়ে ছিলো তা কখনও নিভে যায়নি। বরং পরিস্থিতি গুছিয়ে আনা পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। আর এমনও হয়নি যে, ইসলামের পথের মুজাহিদগণ তখন অবসর বসে ছিলেন; বরং সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী আরও যেসব প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব ছিলো সেসব প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁরা শুধু তাঁদের পদ্ধতি পরিবর্তন করেছিলেন। এই যা।

আমরা এ কথা বুঝতে পারি যে, সে সময়ে মুজাহিদগণ সামরিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকাটা বিনা কারণে ছিলো না এবং এ কারণে তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানানোর সুযোগ নেই। তবে এ কথা বলা যায় যে, সাধারণ মুসলমানরা যদি মুজাহিদগণকে পরিপূর্ণভাবে সব ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা করতো এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোও যদি হিন্দুস্তানকে গোলামীর এ অবস্থা থেকে বের করে আনার ক্ষেত্রে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করতো, তাহলে ইতিহাসের চিত্র হয়তো ভিন্ন রকম হতো।

এ পর্যায়ে আরেকটি বিষয়ও মনে রাখা চাই। বিষয়টি হচ্ছে, উলামায়ে কেরাম দরসে হাদীসে মাশগুল হয়ে যাওয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দীনী খেদমত। কিন্তু তা জিহাদ নয়। মুসলিমরা যদি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে লেগে যায় তাহলে তাও দীনের একটি জরুরি কাজ। কিন্তু তা জিহাদ নয়। যদি কেউ ইসলাহে নফস ও তাযকিয়ামূলক কাজে সময় ব্যয় করতে শুরু করেন তাহলে সেটিও একটি দীনের কাজ। যা কাম্য, কিন্তু তা জিহাদ নয়। দীনী কাজের এ বিভাগগুলো যেমনিভাবে জিহাদ নয়, তেমনিভাবে এ কাজগুলো তার সাধারণ হালাতে জিহাদের প্রস্তুতিরও অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং এ কাজগুলো **وأعدوا لهم ما استطعتم** "আর তোমরা যথাসাধ্য শক্তি অর্জন এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করো" সূরা আনফালের ষাট নম্বর আয়াতের বাস্তবায়নও নয়। তবে হিন্দুস্তানের বিশেষ এ পর্বের দিকে তাকালে পরবর্তী ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে যে, সে সকল মুজাহিদের হাদীসের দরসের ব্যস্ততা, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ইসলাহ ও তাযকিয়ার চেষ্টা প্রচেষ্টা মূলত জিহাদের জন্য রাস্তা তালাশের খাতিরেই ছিলো। তাঁরা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে এমন সব কাজে ব্যস্ত থাকা প্রকাশ করতে চাইতেন যা ব্রিটিশ রাজত্বের জন্য সরাসরি কোনও হুমকি ছিলো না। যার ফলে এসকল তালীম-তাআল্লুম এবং দাওয়াত ও তাবলীগের বরকতে দুই তিন দশক পর এমন সব কার্যক্রম সামনে এসেছে যা হঠাৎ করে এত স্বল্প সময়ের প্রচেষ্টায় সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিলো না।

আকাবির উলামায়ে কেরাম জিহাদ ব্যতীত আরও যে সকল শিরোনামে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে গেছেন এবং এর জন্য আরও যেসকল চেষ্টা প্রচেষ্টা করেন, তার সংক্ষিপ্ত কিছু এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

শামেলী যুদ্ধের পর

শামেলী যুদ্ধ এবং মোগল সাম্রাজ্য পতনের প্রায় নয় বছর পর শামেলী ময়দানের সফল মুজাহিদ মাওলানা কাসেম নানুতবী রহিমাহুল্লাহ ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। দারুল উলূম দেওবন্দে অন্যান্য শাস্ত্র ছাড়াও দরসে হাদীসের অনেক গুরুত্ব ছিলো। এ মাদরাসার প্রথম তালিবে ইলম হলেন মাহমুদ হাসান, যিনি পরবর্তীতে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী নামে প্রসিদ্ধ হন।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহিমাহুল্লাহ

শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহ জিহাদ ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য যেসকল কার্যক্রম সম্পাদন করেন, আপনি বলতে পারেন, সেসকল চিন্তা-চেতনার উৎস মূলত শামেলী রণাঙ্গনের মুজাহিদগণ। শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহ ইলমী প্রজ্ঞা, চিন্তাগত উৎকর্ষতা ও জিহাদের জযবা সরাসরি সেসকল ব্যক্তিবর্গ থেকে গ্রহণ করেন যারা তাঁদের সব শক্তি সামর্থ্য শামেলীর ময়দানে আল্লাহর রাস্তায় পেশ করে দিয়েছেন। সাইয়েদুত তায়েফা হাজী সাহেব (মৃ:১৮৯৯খ্রি.), মাওলানা গাঙ্গুহী (মৃ:১৯০৫খ্রি.) ও মাওলানা কাসেম নানুতবী (মৃ:১৮৮০খ্রি.) রহিমাহুল্লাহ -এ তিন মহান ব্যক্তির প্রত্যেকের কাছ থেকে বিভিন্ন দীনী ইলম শেখার সুযোগ তিনি পান। যার ফলে তাঁর চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডের সেসব সন্দেহ ও অস্পষ্টতা প্রবেশ করতে পারেনি, যা গণতন্ত্রের ফাসাদ এবং দেশীয় জাতীয়তাবাদ ও গোঁড়ামির নষ্টামির মাধ্যমে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার মাঝে প্রবেশ করেছে।

শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহ ১৮৬৬খ্রি. থেকে ১৯০৫খ্রি. প্রায় চল্লিশ বছরের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এ সৎসঙ্গ থেকে উপকৃত হতে থাকেন যা খালেস ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য একমাত্র কর্মপদ্ধতি জিহাদ ও কিতাল ফী সাবীলিল্লাহর চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলের বাতলানো পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানো ছিলো। আর এ কারণেই সে সকল ব্যক্তিবর্গ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের মতো বড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতেও কোনো প্রকার দ্বিধাবোধ করেননি এবং সহায় সম্বলহীন অবস্থায়ও নিজেদের দায়িত্ব আদায়ে অবহেলাকে কোনো প্রকার প্রশ্রয় দেননি।

আর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়গুলো যাকে আমরা নীরবতার সময় বলে আখ্যা দিয়েছি, যা মূলত নীরবতার সময়কাল ছিলো না; বরং সে সময়ে গোপনভাবে গেরিলা পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও জিহাদের প্রস্তুতি চলছিলো, সে সময়গুলোতে শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহ সে সকল মহান ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্যের বরকতে হাদীসের দরসগাহগুলোতে, তাযকিয়ার খানকাগুলোতে এবং দাওয়াত ও তাবলীগের শিরোনামে নিজের যিম্মাদারি আদায় করেন।

শায়খুল হিন্দের কর্মপদ্ধতি

বাহ্যিক নিষ্ক্রিয়তার এই সুদীর্ঘ সময় অতিক্রম করার পর শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহ আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি তাঁর আকাবির পূর্বসূরিগণের ত্যাগ ও কুরবানীর ফল সংগ্রহ করার জন্য মৌলিকভাবে তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমত, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য হিন্দুস্তানের মুসলমানদেরকে প্রস্তুত করা। দ্বিতীয়ত, তাঁর আত্মার সন্তান অর্থাৎ শাগরেদগণের মাঝে দীনের মূল রূপ জাগিয়ে তোলা এবং তাঁদেরকে তাঁদের দায়িত্ব ও ফরয যিম্মাদারির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তৃতীয়ত, পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশকে এক সারিতে এনে খিলাফতে উসমানিয়াকে সাহায্য করা এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা। মূলত এটাই সেই উত্তরাধিকার যা তিনি তাঁর আকাবির পূর্বসূরিদের থেকে পেয়েছেন এবং এটাই সে স্ফুলিঙ্গ ছিলো যা থেকে তিনি জিহাদের বাতি প্রজ্বলিত করেন।

শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহ তাঁর এ তিনটি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথমটির জন্য আযাদ হিন্দ এবং দ্বিতীয়টির জন্য জমইয়াতুল আনসার শিরোনামে কাজ শুরু করেন, আর তৃতীয় পদক্ষেপের জন্য বাইরের দেশগুলো সফর করেন। এ তিনটি পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত ছক দেখুন।

নুযহাতুল খাওয়াতিরের বিবরণ

শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহ এর তিনটি পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত ছক আপনি নুযহাতুল খাওয়াতির-এর এ ইবারতে পেয়ে যাবেন-

وكان قد وضع خطة لتحرير الهند من حكم الإنجليز، كان يريد أن يستعين فيها بالحكومة الأفغانية والخلافة العثمانية، وهيأ لها جماعة من تلاميذه وممن يثق بهم من أصحابه، وكان في مقدمتهم المولوي عبيد الله السندي، وأرسله إلى أفغانستان، وكان الاتصال بينه وبين تلاميذه وأصحابه في الحدود الشمالية وفي أفغانستان، ولما تم لهم بعض ذلك ومهدوا الأرض للثورة واشتدت عليه الرقابةفي الهند سافر إلى الحجاز سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف، وأقام بمكة وقابل غالب باشا الوالي التركي سراً، ثم سافر إلى المدينة المنورة وقابل أنور باشا وزير الحربية وجمال باشا القائد العام للجيش العثماني الرابع حين زار المدينة المنورة، وفاوضهما في طرق إعانة المسلمين في الهند ونفي الإنجليز منه، وأخذ منهما رسالة سرية إلى الشعب الهندي، والوعد بتأييد القضية الهندية، وحمل أهل الهند على مساعدة الشيخ محمود حسن والاعتماد عليه، وأخذت صور هذه الوثيقة، وقرر تسريبها إلى الهند وأفغانستان بطريقة سرية، واشتهرت فيها بعد بالرسائل الحريرية وصلت إلى الهند، وأراد الشيخ محمود حسن أن يصل إلى الحدود الشمالية الحرة بين أفغانستان والهند عن طريق إيران فسافر إلى الطائف، ورجع إلى مكة وأقام بها مدة، ودرس في صحيح البخاري وحج، وكان ذلك سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وألف. واكتشفت الحكومة الإنجليزية المؤامرة، وعرفت قضية الرسائل الحريرية، فصرفت عنايتها إلى القبض على زعيم هذه الحركة وقطب رحاها، وكان الشريف حسين أمير مكة قد خرج عن الدولة المتبوعة العثمانية، وثار عليها بتحريض الدولة الإنكليزية فأوعزت إلى الشريف بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الحكومة الإنجليزية، فألقي القبض عليه في صفر سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وألف، ومعه المولوي حسين أحمد الفيض آبادي والحكيم نصرت حسين الكوروي والمولوي عزيز كل والمولوي وحيد أحمد، وسفر هؤلاء في الثامن عشر من ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وألف

إلى مصــر ومنها إلى مالطه حيث وصــلوا ســلخ ربيع الآخر ســـنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وألف.

نزهة الخواطر لعبد الحي الحسـني المتوفى سـنة 1341ه، ص:1378، دار ابن حزم بيروت الطبعة الأولى 1420ه 1999ء

'নুযহাতুল খাওয়াতির' এর এ বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি প্রথমে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের অন্তরে আগ্রাসী কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের জযবা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। এরপর এ প্রচেষ্টাকে একটি বিশেষ বিন্যাসে বিন্যস্ত করে মূল উদ্দেশ্যকে নববী পদ্ধতি ও মাসূর পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করার জন্য মুজাহিদ সংগ্রহ করেন। আফগানিস্তান ও সীমান্ত এলাকাগুলো থেকে তাঁর শাগরেদ ও ভক্ত মুরিদগণের মাধ্যমে এ কাজটি এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। কাফেরদের বিরুদ্ধে এ দুটি ফ্রন্টকে একটি পর্যায়ে প্রস্তুত করার পর বাইরের দেশগুলোতে সফর শুরু করেন। আর সে সফরে তিনি মুসলিম বিশ্বের দায়িত্বশীল ও নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করেন। বিশেষভাবে খিলাফতে উসমানিয়া তুর্কী যা তখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইসলামী হুকুমত ও দারুল ইসলাম ছিলো, তার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন এবং তিনি সে প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে সফলও হন। উসমানী খিলাফতের প্রভাবশালী দায়িত্বশীলগণের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন, সমস্ত সুরতহাল তুলে ধরেন এবং নিজের পদক্ষেপ ও পরিকল্পনার বিন্যাস ও ছক তাঁদের সামনে পেশ করেন। সম্মিলিতভাবে কাজ করার বিষয়ে উভয়পক্ষ ঐক্যমতে পৌঁছান। মুসলমানদের এ আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ শুরু হয়। শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহ এর জীবনী গ্রন্থগুলোতে আপনি এর বিস্তারিত বিবরণ পাবেন। এমনিভাবে শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রহিমাহুল্লাহ রচিত 'নকশে হায়াত' কিতাবেও এর বিস্তারিত বিবরণ দেখা যেতে পারে।

গাদ্দার ও মুনাফিক সব জায়গাতেই থাকে

‘নুযহাতুল খাওয়াতির’ এর বক্তব্য থেকে আপনি এ কথাও জানবেন যে, গাদ্দারদের গাদ্দারীর কারণে এ সকল পরিকল্পনা ইংরেজদের হাতে চলে যায় এবং এ বৈশ্বিক চিন্তা-চেতনার প্রাণ পুরুষ শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহকে গ্রেফতার করার জন্য ইংরেজ সর্ববিদ চেষ্টা শুরু করে দেয়। মক্কার আমীর শরীফ হোসাইন ইংরেজদের ইঙ্গিতে শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতার করে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়, যারা তাঁকে দীর্ঘকালব্যাপী মাল্টার দ্বীপে বন্দী করে রাখে।

কথা সংক্ষেপ করতে চাচ্ছি, কিন্তু বিষয়টিই এমন যে, কিছু কথা না বলে সুরতহাল স্পষ্ট করা একটু জটিল মনে হচ্ছে। মাল্টার দ্বীপে শায়খুল হিন্দের সঙ্গে আরও অন্যান্য উলামায়ে কেরামও বন্দী জীবন কাটান। সেসব উলামায়ে কেরামের মধ্যে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহিমাহুল্লাহ অন্যতম, যিনি তাঁর শায়খের সাথে মাল্টায় বন্দী ছিলেন।

১৯১৭ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত সময়কালে প্রায় তিন বছর এ বন্দীদশা বলবৎ ছিলো। এ সময়টি শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহ এর জীবনের শেষ পর্ব ছিলো এবং সিদ্ধান্তমূলক পর্বও ছিলো। যে সময়ে তিনি তাঁর জীবনের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে একটি ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতে প্রয়াসী হন। বিশ্বের একজন যিম্মাদার হিসাবে তিনি নিজ দেশের সাধারণ মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেন, নিজের শাগরেদ ও ভক্ত মুরিদদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য একটি বিশেষ বিন্যাসে বিন্যস্ত করেন এবং বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর প্রভাবশালী দায়িত্বশীলগণকে এ কাজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বিশ্বব্যাপী একটি পরিকল্পনার ছকও আঁকেন। আর একে বাস্তবায়ন করার পর্বে এসে চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত অবস্থায় শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে যান। বন্দী অবস্থায়ও যতটুকু সম্ভব নিজের এ চিন্তা-চেতনাকে ব্যাপকতা দান করার জন্য কাজ করতে থাকেন এবং অন্যদেরকেও এর জন্য উৎসাহ দিয়ে যেতে থাকেন।

শায়খুল হিন্দের চিন্তা-চেতনা এবং তাঁর কর্মকাণ্ডের উপর দৃষ্টিপাত করলে আপনি নববী পথ ও পদ্ধতির ঝলক দেখতে পাবেন। তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনায় পুরা উম্মতের যিম্মাদারি নিজের কাঁধে অনুভব করতেন। আর সে কারণেই তিনি সবাইকে সঙ্গে

নিয়ে চলেছেন। এমন ব্যক্তি কখনও পরিস্থিতির শিকার হন না, পরিস্থিতির কারণে বিচলিত ও প্রভাবিত হন না এবং বড় থেকে বড় শক্তি দেখেও ঘাবড়ে যান না।

বন্দী থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বিভিন্ন অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে কয়েক মাস পরই তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা, খিলাফত পুনরুদ্ধার করা এবং দারুল হারবকে পুনরায় দারুল ইসলামে রূপান্তরিত করার জন্য জিহাদের একটি অনুসরণীয় উদারণ রেখে যান। আল্লাহ তাঁর সকল নেক চেষ্টা প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ...)